বহির্বিশ্বে জীবনের উৎপত্তির খোঁজে

(প্রাণের প্রান জাগিছে তোমারি প্রাণে -৭)

ফরিদ আহমেদ

পূর্ববর্তী পর্বের পর...

তবু ভালবাসি
চমকে বিনাশ মাঝে অস্তিত্বের হাসি
আনন্দের বেগে।
মরণের বীণাতারে উঠে জেগে
জীবনের গান,
নিরন্তর ধাবমান
চঞ্চল মাধুরী।
ক্ষণে ক্ষণে উঠে স্ফুরি
শাশ্বতের দীপশিখা
উচ্ছলিয়া মুহূর্তের মরীচিকা।

--রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্যানস্পারমিয়া (Panspermia)

বেশিরভাগ বিজ্ঞানীরাই অনেকদিন ধরে বিশ্বাস করে আসছিলেন যে পৃথিবীতে প্রাণের উৎপত্তি ও বিকাশ একান্তভাবেই পৃথিবীর নিজস্ব ঘটনা। প্রচলিত চিন্তা-ভাবনা অনুযায়ী, কয়েক বিলিয়ন বছর আগে রাসায়নিক বিবর্তনের ফলশ্রুতিতে উদ্ভব হয়েছে আদিমতম জীবন্ত কোষের। প্রাণের উৎপত্তির এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় অজৈবজনি (Abiogenesis) যা এ বইয়ের প্রথম পাঁচটি অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। এর বিকল্প একটি সম্ভাবনাও আছে তা হচ্ছে জীবন্ত কোষ না হলেও এদের পূর্বাবস্থা অর্থাৎ 'জীবনের বীজ' মহাবিশ্বের অন্য কোথাও থেকে আসতে পারে। গত কয়েক দশকের বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি এই ধারণাকে বেশ খানিকটা বিশ্বাসযোগ্যতাও দিচ্ছে। অনেকেই এখন ধারণা পোষণ করেন যে পৃথিবীর জৈবমন্ডল মহাজাগতিক কোন বীজ থেকে উদ্ভূত হলেও হতে পারে।

বিজ্ঞানে না হলেও অন্ততঃ জনপ্রিয় ধারার কল্পবিজ্ঞানে অনেকদিন ধরেই এ ধরণের একটা ধারণা ঠাঁই করে নিয়েছিল যে, বহু আগে মহাজাগতিক কোন সভ্যতার মাধ্যমে আমাদের এই পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভব ঘটেছে। আমরা হয়তো পৃথিবী নামক ল্যাবরেটরীতে তাদের সুনির্দিষ্ট পরীক্ষা নিরীক্ষার ফসল । কিংবা বেখেয়ালে তাদের আবর্জনা আমাদের গ্রহে ছুড়ে ফেলার

ফলে এখানে বিকশিত হয়েছে জীবনের। বিজ্ঞানীরা অবশ্য এধরনের রং বেরং-এর কল্পকাহিনীকে খুব একটা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেন না। কিন্তু তারপরেও- অত্যন্ত ক্ষুদ্র স্কেলে হলেও মহাকাশ থেকে অন্য একটি উপায়ে পৃথিবীতে প্রাণের বীজের আগমন ঘটার সম্ভাবনাকে অনেক বিজ্ঞানী গুরুত্ব দিয়েই বিবেচনা করেন।

মহাশূন্যের হিমশীতল পরিবেশে কিছু সাধারণ অণু দুর্বল রেডিও এনার্জি নির্গত করে চলেছে প্রতিনিয়ত। জোতির্বিজ্ঞানীরা রেডিও টেলিস্কোপের মাধ্যমে এধরনের অণুগুলোকে পর্যবেক্ষণ করে আসছেন অনেকদিন ধরেই। খুব বেশি দিন আগে নয়, বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করতেন যে, সামান্য কিছুসংখ্যক পরমাণুর সমন্বয়ে গঠিত সরল ধরনের অণু ছাড়া অন্য কোন অণু মহাশূন্যে থাকা অসম্ভব। কিন্তু বিজ্ঞানীদের বিস্ময়ের পরিসীমা রইলো যখন তারা মহাশূন্যে আবিষ্কার করলেন বিভিন্ন ধরনের অনেক জটিল অণু। যেহেতু জটিল অণুর অস্তিত্ব আছে, কাজেই মহাশূন্যের গ্যাসীয় ক্ষেত্রে জীবনের মৌলিক অণুসমুহ যেমন অ্যামিনো এ্যাসিড গঠিত হওয়া খুব অসম্ভব কিছু নয়। পৃথিবী পৃষ্ঠে ভূপতিত হওয়া অনেক উল্কাপিন্ডেও একই ধরনের জটিল অণু পাওয়া গেছে। মহাশূন্যে ধূলিকণাকে আশ্রয় করেও জটিল অণু থাকতে পারে এবং যদি সেখানে পর্যাপ্ত সংখ্যক অণু থাকে তবে তাদের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটাও অসম্ভব নয়। যদিও মহাশূন্যের হিম ঠান্ডার কারণে এর জন্য প্রয়োজন হবে মিলিয়ন মিলিয়ন বছরের।

প্রায় এক শতাব্দী আগে নোবেল পুরষ্কার বিজয়ী রসায়নবিদ আরহেনিয়াস (Svante Arrhenius) এবং সত্তুরের দশকে ফ্রেড হোয়েল (Fred Hoyle) এবং চন্দ্র বিক্রমাসিংহে (Chandra Wickramasinghe) মত দেন যে, জীবনের মৌলিক ধরণ খুব সম্ভবত উদ্ভব হয়েছে মহাশূন্যে। উল্কাপিন্ড বা ধুমকেতুতে সওয়ার হয়ে অতঃপর ‘প্রাণ’এসে পৌঁছেছে পৃথিবীতে। পৃথিবীতে প্রাণের উৎপত্তির এই ধারণাকেই বলা হয় প্যানস্পারমিয়া (Panspermia)। নব্বই এর দশকে Hale-Bopp এবং Hyakutake ধুমকেতু পর্যবেক্ষণরত বিজ্ঞানীরা দেখলেন যে এই ধুমকেতুদ্বয় থেকে নিঃসৃত বাষ্পের মধ্যে জটিল রাসায়নিক পদার্থ মিথেন এবং ইথেন সহ আরো অনেক আকর্ষণীয় অণু রয়েছে।

ম্যাক্স বার্নস্টেইন (Max Bernstein) এবং জ্যাসন ডর্কিন (Jason Dworkin) নব্বই এর দশকের শেষ দিকে বহির্বিশ্বে জীবনের উৎপত্তির এই সম্ভাবনা নিয়ে নাসার ক্যালিফোর্নিয়াস্থ অ্যাস্ট্রোবায়োলজী ল্যাবরেটরীতে কাজ শুরু করেন। বরফ এবং ন্যাপথালিনের সংমিশ্রণে তারা মহাশূন্যের কৃত্রিম পরিবেশ তৈরি করেন এবং মহাশূন্যে রেডিও অ্যাস্ট্রোনোমারদের আবিষ্কৃত রাসায়নিক পদার্থ Polycyclic aramatic hydrocarbons (PAH) যোগ করেন এর সাথে। অতঃপর এর মধ্য দিয়ে ক্রমাগত চালনা করেন অতি বেগুনি রশ্মি। এর ফলে দেখা

গেল যে, কিছু রাসায়নিক বিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এগুলো আংটি আকৃতির quinones অণুতে পরিণত হয়েছে যা জীবন্ত কোষে প্রাপ্ত অণুর হুবহু প্রতিরূপ। কাজেই মহাশূন্যের সুশীতল পরিবেশের মধ্যে সুদীর্ঘ সময়ে এই অণুগুলো একত্রিত হয়ে অত্যন্ত প্রাথমিক ধরনের জীবন গড়ে তুলতে পারে।

জীবন্ত হোক বা না হোক উল্কাপিন্ড বা ধুমকেতুর মাধ্যমে পৃথিবিতে আগত রাসায়নিক পদার্থসমূহ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমেরিকান বিজ্ঞানী ক্রিস্টোফার চাইবা (Christopher Chyba) বিশ্বাস করেন যে, পৃথিবীর সাগর মহাসাগরের সমস্ত জল এবং বায়ুমন্ডলের সব বাতাসই ধুমকেতু থেকে এসেছে। কারণ পৃথিবী শীতল হওয়ার আগে এতে কোন জল বা বাতাস কিছুই ছিল না ।

পঞ্চাশের দশকে রসায়নবিদ হ্যারলড উরে (Harold Urey) এবং তার ছাত্র স্ট্যানলি মিলার (Stanley Millar) শিকাগো বিশ্বাবিদ্যালয়ের গবেষণাগারে জীবনের উৎপত্তির জন্য কোন ধরনের পরিবেশ প্রয়োজন সে বিষয়ে তাদের সুবিখ্যাত গবেষণা পরিচালনা করেন (চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায় দ্রষ্টব্য) । প্রাণের উৎপত্তির আগে পৃথিবীর শৈশব অবস্থায় যে সমস্ত উপাদান বিদ্যমান ছিল তাদের একটি মিশ্রণ বায়ু নিরোধক ফ্লাস্কে তারা তৈরি করেন। তারপর এর মধ্য দিয়ে শত শত ঘন্টা ধরে ইলেক্ট্রিক চার্জ, স্পার্ক পরিচালনা করেন তারা। ফ্লাস্ক খোলার পর তারা দেখতে পান যে, রাসায়নিক বিক্রিয়া সরল ধরণের অণুগুলোকে জটিল ধরনের অণুতে যেমন এ্যামিনো এ্যাসিডে রূপান্তরিত করে ফেলেছে। এই গবেষণার ফলাফল অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ এই কারণে যে, এ্যামিনো এ্যাসিড প্রোটিন গঠনের উপাদান এবং প্রোটিনই মূলত পরবর্তীতে তৈরি করে ডিএনএ। মাত্র কয়েক সপ্তাহে গবেষণাগারেই যদি এই বিস্ময়কর পরিবর্তন ঘটতে পারে তবে প্রকৃতিতে লক্ষ কোটি বছরে কি পরিমাণ পরিবর্তন হয়েছে তা সহজেই অনুমেয়।

গত বিশ বছর ধরে বিজ্ঞানীরা উল্কাপিন্ডের অভ্যন্তরে আটকে পড়া গ্যাসের মিশ্রনকে বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, পৃথিবীতে প্রাপ্ত তিরিশটির বেশি উল্কাপিন্ড মঙ্গলের পৃষ্ঠ থেকে এসেছে। ইতোমধ্যে জীববিজ্ঞানীরা এমন কিছু জীবাণু আবিষ্কার করেছেন যে গুলো এই উল্কাপিন্ডের অভ্যন্তরে থেকে মহাশূন্যে স্বল্প পাল্লার ভ্রমণে টিকে থাকতে সক্ষম (যদিও আপাতত কেউই দাবী করছে না যে, এই জীবাণুগুলো সত্যি সত্যিই গ্রহান্তরে ভ্রমণ করেছে)। কিন্তু জীবাণুগুলি এই ধারণার নীতিগত ভিত্তির প্রমাণ হিসাবে কাজ করেছে। এটা অসম্ভব নয় যে, প্রাণ হয়তো উৎপত্তি হয়েছিল মঙ্গলে। তারপর তা স্থানান্তরিত হয়েছে পৃথিবীতে। অথবা এর বিপরীতটাও হতে পারে, পৃথিবীতে উৎপত্তি হয়ে সেখান থেকে প্রাণ গেছে মঙ্গলে। এই বিষয়ে সম্যক জ্ঞান অর্জনের জন্য গবেষকরা বর্তমানে গভীরভাবে জৈবিক বস্তুসমূহকে এক

গ্রহ থেকে অন্য গ্রহে স্থানান্তরের উপায় নিয়ে গবেষণা করছেন । এই প্রচেষ্টা হয়তো আধুনিক বিজ্ঞানের কিছু অমূল্য প্রশ্ন যেমন, কোথায় এবং কেমন করে প্রাণের উৎপত্তি হলো কিংবা পুরোপুরি ভিন্ন ধরনের জৈবিক কাঠামো ভিত্তিক প্রাণ সম্ভব কিনা অথবা এই মহাবিশ্বে প্রাণ কি অতি স্বাভাবিক ঘটনা কিনা- ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর জোগাতে সাহায্য করবে।

উনবিংশ শতাব্দীতে লুই পাস্তুর কর্তৃক স্বতঃজনন তত্ত্ব পরিত্যক্ত হবার পর দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিকদের কাছে জড় বস্তু থেকে প্রাণের উৎপত্তি এমনই অবাস্তব ছিল যে, তাদের মধ্যে অনেকেই ধারণা পোষণ করতেন যে রেডিমেড প্রাণ পৃথিবীর বাইরের অন্য কোথাও থেকে এসেছে। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে ধারণাটা জোরালো হলেও প্যানস্পারমিয়ার মূল প্রকল্পটি আসলে অনেক প্রাচীন। আড়াই হাজার বছর আগের গ্রীক দার্শনিক আনাক্সাগোরাস (Anaxagorus) প্যানস্পারমিয়া (Panspermia) নামের একটি অনুকল্প (Hypothesis) প্রস্তাব করেন। এই অনুকল্প অনুযায়ী সমস্ত প্রাণী এবং সমস্ত জড়বস্তু বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অতি ক্ষুদ্র বীজ থেকে উৎপন্ন হয়েছে।

প্যানস্পারমিয়ার আধুনিক রূপটি অবশ্য পৃথিবীতে কিভাবে প্রাণের উৎপত্তি হলো তার চেয়ে কিভাবে জৈবিক বস্তুসমূহ তৈজস্ক্রিয়তা, শৈত্যের প্রভাব ইত্যাদির মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে 'সজীর অবস্থায়' এসে পৌঁছেছে তার সমাধান পেতে বেশি আগ্রহী। যেখানেই উৎপত্তি হোক না কেন প্রাণকে জড় বস্ত থেকেই উৎপত্তি হতে হয়েছে এটা নিঃসন্দেহ। এই অজৈবজনির (Abiogenesis) বাস্তবতা তো পঞ্চাশের দশকে ইউরে-মিলার তাঁদের বিখ্যাত পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ করেই দেখিয়েছেন। এই বাস্তবতার মঞ্চায়ন পৃথিবীতে হতে পারে, কিংবা হতে পারে দূরবর্তী কোন গ্রহে, কিংবা হয়ত মহাশূন্যে।

প্রাণ উৎপত্তির এই নবতর ধারণাই প্যানস্পারমিয়া নিয়ে বৈজ্ঞানিক বিতর্ককে উস্কে দিয়েছে। সৌরজগতের প্রাথমিক বিশৃঙ্খল অবস্থায় পৃথিবীতে এসে পড়েছে সরল জৈবিক বস্তু সম্বলিত অসংখ্য উল্কাপিন্ড। তরুণ সেই পৃথিবী এনজাইম্যাটিক ফাংশন সম্বলিত জটিল ধরনের জৈবিক বস্তুও যে পায়নি তারও নিশ্চয়তা নেই। এই জৈবিক পদার্থগুলো যদিও প্রাণহীন অবস্থায় ছিল, কিন্তু জীবনের দিকে অনেকখানি অগ্রসর অবস্থায় যে ছিল তা বলাই বাহুল্য। পৃথিবীর প্রাণ সহায়ক পরিবেশে এসে পড়ার পর এই অণুগুলো জীবন্ত কোষে পরিণত হওয়ার বিবর্তনের দিকে ধাপে ধাপে এগিয়ে গেছে। অবশ্য মধ্যবর্তী একটি অবস্থাও সম্ভব। প্রাণ হয়তো পৃথিবী এবং মহাবিশ্ব দু'জায়গাতেই উদ্ভব হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে প্রাণ উৎপত্তির কোন পর্যায় কোথায় হয়েছে এবং উৎপত্তির পর প্রাণ কতদূর বিস্তৃত হয়েছে?

প্যানস্পারমিয়া নিয়ে গবেষণাকারী বিজ্ঞানীরা প্রথম দিকে এই ধারণার যথার্থতা যাচাইয়ের দিকেই শুধুমাত্র মনযোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু বর্তমানে তারা অন্য গ্রহ বা উপগ্রহ থেকে কি পরিমাণ জৈবিক বস্তু পৃথিবীতে এসেছে তা পরিমাপ করার চেষ্টা করছেন। আন্তঃগ্রহিক এই যাত্রা শুরু করার আগে বস্তু গুলোকে আগে উল্কা বা ধুমকেতুর প্রভাবে তাদের নিজস্ব গ্রহ বা উপগ্রহ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হয়েছে। মহাশূন্যে ভ্রমনের এই পর্যায়ে এসে প্রস্তর খন্ড বা ধূলিকণাগুলোকে অন্য গ্রহ বা উপগ্রহের মাধ্যাকর্ষণের আওতার মধ্যে পড়তে হয়েছে এবং তারপরে যথেষ্ট পতনশীল বেগ অর্জন করতে হয়েছে সেই গ্রহের বায়ুমন্ডলকে ভেদ করে ভূ-পৃষ্ঠে এসে পড়ার জন্য। এই ধরনের স্থানান্তর খুব ঘন ঘনই সৌরজগতে ঘটেছে। দেখা গেছে গ্রহচ্যুত বস্তুদের সূর্যের নিকটবর্তী গ্রহের তুলনায় দূরবর্তী গ্রহের দিকে এবং বৃহৎ গ্রহের উপর পতিত হওয়া সহজতর। ইউনিভার্সিটি অফ ব্রিটিশ কলম্বিয়ার অ্যাস্ট্রোফিজিসিষ্ট ব্রেট গ্লাডম্যান (Bret Gladman) এর করা ডাইনামায়িক সিম্যুলেশনের ফলাফল অনুযায়ী মঙ্গল থেকে পৃথিবীতে বস্তুসমূহের স্থানান্তরের হার পৃথিবী থেকে মঙ্গলে স্থানান্তরের তুলনায় অনেক বেশি। এই কারণে প্যানস্পারমিয়ার যে সম্ভাবনাটি ইদানিংকালে সবচেয়ে বেশি আলোচিত তা হচ্ছে মঙ্গল থেকে পৃথিবীতে অণুজীব বা এর প্রাক-অবস্থার স্থানান্তর।

মঙ্গলের উপর উল্কা বা ধুমকেতুর প্রভাব সংক্রান্ত সিম্যুলেশনে দেখা যায় যে, গ্রহচ্যুত বস্তুগুলো বিভিন্ন কক্ষপথে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে। গ্লাডম্যান এবং তার সহকর্মীরা হিসাব করে দেখলেন যে, প্রতি কয়েক মিলিয়ন বছরেই মঙ্গল উল্কা বা ধুমকেতুর প্রভাবে বড় ধরনের ঝাঁকুনি খায়। এতে করে এর পৃষ্ঠদেশ থেকে প্রস্তরসমূহ বিচ্যুত হয়ে মহাশূন্যে রওনা দেয় এবং পরবর্তীতে এর কিছু অংশ পৃথিবীতে এসে পতিত হয়। আন্তঃগ্রহিক যাত্রা সাধারণত খুবই সুদীর্ঘ হয়ে থাকে। মঙ্গল থেকে পৃথিবীতে পতিত বেশিরভাগ ১ টনের উল্কাপিন্ডগুলো কয়েক মিলিয়ন বছর মহাকাশে কাটিয়ে তারপর পৃথিবীতে আসে। কিন্তু অতি ক্ষুদ্র একটা অংশ (প্রতি মিলিওনে ১টি) এক বছরেরও কম সময়ের মধ্যে পৃথিবীতে এসে পড়ে। মুঠি সাইজের পাথরগুলো বছর তিনেকের মধ্যেই পৃথিবীতে পৌঁছে যায়। ছোট ছোট নূড়িপাথর বা ধূলিকণাগুলো আরো দ্রুতগতিতে আন্তঃগ্রহিক যাত্রা সম্পন্ন করে।

প্রশ্ন হচ্ছে জৈবিক অস্তিত্ব এই সুদীর্ঘ মহাকাশ ভ্রমনে বেঁচে থাকতে পারবে কি না? প্রথমতঃ ধরা যাক, যে ভয়ংকর প্রভাবে উল্কাপিন্ড তার নিজস্ব গ্রহ থেক বিচ্যুত হচ্ছে তার প্রভাবে অণুজীবগুলো টিকে থাকতে পারবে কিনা? সাম্প্রতিক গবেষণাগার পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, কিছু ব্যাক্টেরিয়া উচ্চ চাপসম্পন্ন গ্রহচ্যুতির গতি এবং ধাক্কা সামাল দিয়ে টিকে থাকতে সক্ষম। অবশ্য যদি গ্রহচ্যুতির প্রাক প্রভাব এবং প্রচন্ড গতির কারণে যে তাপ উৎপন্ন হবে তাতে উল্কাপিন্ডের অভ্যন্তরের জৈবিক বস্তুকে একেবারেই ধ্বংস করে না দেয়।

প্লানেটারি ভূতত্ত্ববিদরা আগে বিশ্বাস করতেন যে, গ্রহচ্যুতির প্রাক-প্রভাব এবং মঙ্গলের মুক্তিবেগের চেয়ে বেশি গতিসম্পন্ন যে কোন বস্তু নিশ্চিতভাবেই বাষ্পীভূত হয়ে যাওয়ার কথা বা নিদেনপক্ষে গলে যাবে এটাই স্বাভাবিক। মঙ্গল বা চাঁদ থেকে আগত অগলিত এবং প্রায় অক্ষত উল্কাপিন্ড আবিষ্কৃত হওয়ার পর অবশ্য এই ধারণা পরবর্তীতে বাতিল হয়ে গেছে। ইউনিভার্সিটি অফ আরিজোনার বিজ্ঞানী এইচ জে মেলোশ (H. Jay Melosh) হিসাব করে দেখান যে, মঙ্গলের স্বল্প সংখ্যক প্রস্তরখন্ড কোন রকম উত্তপ্ত না হয়েই পৃথিবীতে চলে আসতে পারে। মেলোশ বলেন যে, উল্কার বা ধুমকেতুর আঘাতে যে উর্ধ্বমুখী চাপের সৃষ্টি হয় তা ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি এসে ১৮০ ডিগ্রি কোনে ঘুরে যায় ফলে ভূপৃষ্ঠের পাতলা একটি আস্তরণের নীচে এই চাপ বাতিল হয়ে যায়। একে বলা হয় 'Spall zone'। ভূপৃষ্ঠের নীচের স্তর যেখানে ভয়ংকর চাপ অনুভব করে, সেখানে এই 'Spall zone' খুব কম চাপই অনুভব করে। ফলে পৃষ্ঠদেশের প্রস্তর অবিকৃত অবস্থায় প্রবল গতিতে মহাশূন্যে বিচ্যুত হতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে প্রবেশ করার সময় টিকে থাকার সম্ভাবনা কতটুকু? ইউনিভার্সিটি অফ শিকাগোর এডওয়ার্ড এন্ডার্স (Edward Anders) দেখিয়েছেন যে, ইন্টার-প্লানেটারি ধূলিকণাগুলো পৃথিবীর বায়ুমন্ডলের সবচেয়ে উঁচু স্তরে ধীরে ধীরে নেমে আসে। ফলে সেগুলো তেমন একটা উত্তপ্ত হয় না। কিন্তু অন্যদিকে কিছুটা ভারী প্রস্তরখন্ড ধেয়ে আসে আক্ষরিক অর্থেই উল্কার গতিতে। ফলে তাদের উপরিভাগ প্রচন্ড তাপে গলে যায় পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে প্রবেশ করার পর পরই। তবে এই তাপ উল্কাপিন্ডের অভ্যন্তরে মাত্র কয়েক মিলিমিটার পর্যন্ত ঢুকতে পারে। কাজেই প্রস্তরখণ্ডের অভ্যন্তরে অবস্থিত অণুজীবগুলোর টিকে থাকার সম্ভাবনা অনেক বেশি।

চিত্র ৭.১ : এ্যান্টার্কটিকার অ্যালান হিলে আবিস্কৃত হওয়া উল্কাপিন্ড ALH84001

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, পৃথিবীতে প্রাণের উৎপত্তির ক্ষেত্রে পতিত উল্কাপিন্ডের সম্পর্ক থাকা পুরোপুরি অসম্ভব নয়। কিন্তু উল্কাপিন্ড শুধু পৃথিবীতেই আঘাত হানে না, অন্যান্য গ্রহেও তা টুপ টাপ ঝরে পড়ছে হর হামেশা। কাজেই অন্যান্য গ্রহেও জীবনের অস্তিত্ব থাকাকে উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না একেবারেই। মহাবিশ্বের অন্যত্র প্রাণের অস্তিত্ব থাকার এই তত্ত্ব জনপ্রিয় হওয়ার পিছনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছিল ALH84001 নামের উল্কাপিন্ডটি। গত কয়েক বছর ধরে বিজ্ঞানীরা দুই ধরনের মঙ্গলের উল্কাপিন্ডকে বিশ্লেষণ করে আসছেন। এগারো মিলিয়ন বছর আগে উল্কা বা ধূমকেতুর আঘাতে মঙ্গল থেকে বিচ্যুত একগুচ্ছ প্রস্তর খন্ড যাদেরকে বলা হয় নাখলাইট (nakhlite) এবং এদেরও আরো চার মিলিয়ন বছর আগে মঙ্গল ত্যাগকারী উল্কাপিন্ড ALH84001.

NASA-র বিজ্ঞানী ডোনালড বোগার্ড (Donald Bogard) এবং প্রাট জনসন (Prat Johnson) প্রস্তর খন্ডের বুদ্বুদের মধ্যকার বাতাসকে অবিকৃত অবস্থায় উদ্ধার করে তাদের হিউস্টন গবেষণাগারে পরীক্ষা করেন। তারা দেখেন যে এই বাতাস মনুষ্যবিহীন মহাকাশযান ভাইকিং প্রেরিত মঙ্গলের বায়ুমন্ডলের সাথে পুরোপুরি মিলে যায়। কাজেই সন্দেহের কোন অবকাশ নাই যে, ALH84001 একসময় মূলত মঙ্গলেরই অংশ ছিল। ১৯৯৬ সালে নাসার বিজ্ঞানী ডেভিড ম্যাককে (David Mckay) এবং তার সহকর্মীরা উল্কাপিন্ডটির মধ্যেকার মাইক্রোস্কোপিক ব্যাক্টেরিয়ার ফসিলের আকৃতির ছবি তোলেন। বিজ্ঞানীদের অবশ্য কোন ভাবেই প্রমাণ করার উপায় নেই যে, এই আকৃতি সত্যিই মঙ্গলের ব্যক্টেরিয়ার ফসিল নাকি মাইক্রোস্কোপিক প্রস্তর গঠনের বিচিত্ররূপ মাত্র।

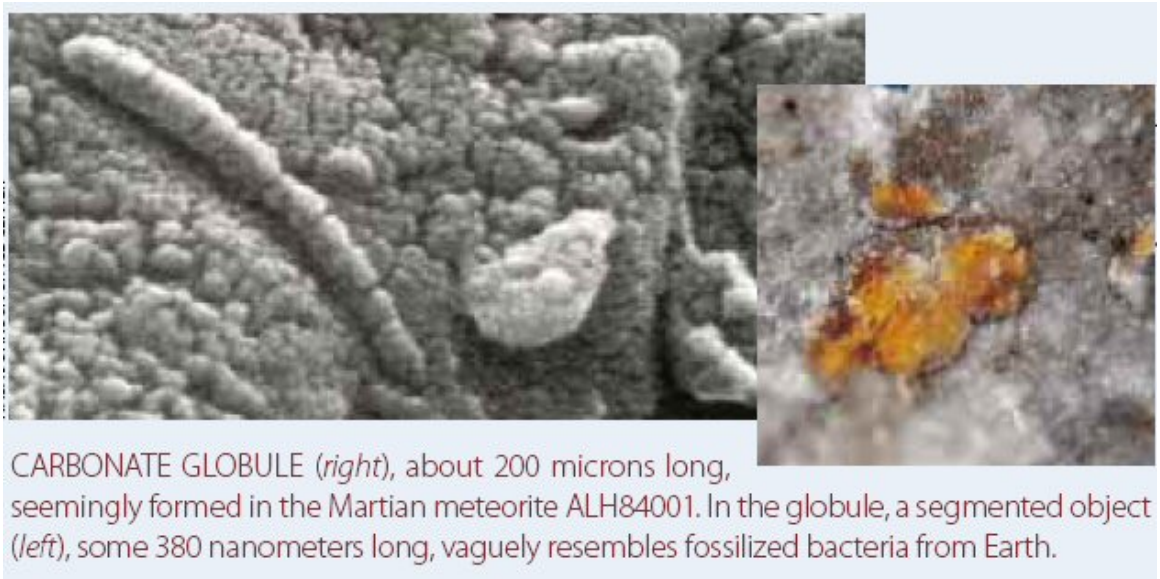

চিত্র ৭.২ : ALH84001 উল্কাপিন্ডে পাওয়া কার্বন যৌগ, পৃথিবীতে পাওয়া ব্যকটেরিয়ার জীবাশ্মের সাথে মিল পাওয়া যাচ্ছে।

ALH84001-এর বিস্ময়কর যাত্রা শুরু হয়েছিল মঙ্গল গ্রহ থেকে। এ গ্রহটি দীর্ঘদিন ধরেই পৃথিবীর বাইরে প্রাণের অস্তিত্ব থাকার সম্ভাবনার নিরিখে বিজ্ঞানীদের পছন্দের তালিকার প্রথম দিকে আছে। পৃথিবী এবং মঙ্গলসহ সৌরজগতের সব গ্রহই তৈরি হয়েছে বিশাল ধুলি মেঘ সৌর নীহারিকা (Solar nebula) থেকে। মধ্যাকর্ষ এবং ঘূর্ণায়মান গতির কারণে ধূলিকণাগুলো কাছাকাছি এসে প্রথমে তৈরি হয়েছে নুড়ি, তারপর পাথর এবং সবশেষে বিশালাকৃতির পাথর যাকে বলা হয় "planetesimals". সৌরজগতের ইতিহাসের প্রথম এক বিলিয়ন বছরে planetesimal গুলো একটার সাথে আরেকটার অনবরত তৈরি হয়েছে মুহুর্মুহ সংঘর্ষ। বৃহৎ বস্তুর মধ্যাকর্ষ শক্তি সংঘর্ষমান বড় বড় পাথরগুলোকে একত্রিত করেছে এবং এই প্রক্রিয়া সৌর নীহারিকা পুরোপুরি গ্রহজগত এবং অন্যান্য উপাদান তৈরি হওয়া পর্যন্ত চলেছে। ইতোমধ্যে হালকা গ্যাস দিয়ে তৈরি কিন্তু গ্রহগুলোর তুলনায় অনেক বেশি ভর সম্পন্ন সূর্য নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছিল সৌরজগতের কেন্দ্রে ।

৪.৬ বিলিয়ন বছর আগে বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরগুলোই কয়েকটি গ্রহে পরিণত হয়। আভ্যন্তরীণ তাপ এদেরকে আংশিকভাবে গলিয়ে ফেলে এবং মধ্যাকর্ষ এদের স্ফেরিক্যাল আকৃতি গঠন করে দেয়। মঙ্গলের পৃষ্ঠে সামান্য পরিমাণ কিছু রাসায়নিক পদার্থ রুবিডিয়াম (Rubidium), স্ট্রনটিয়াম (Strontium), আরগন (Argon), সামারিয়াম (Samarium), এবং নিওডাইমিয়াম (Neodymium) এর সংমিশ্রণে ছোট ছোট পাথরগুলো ক্রিস্টালাইজড হয়ে যায়। ALH84001 এদেরই একজন। এই সমস্ত পদার্থের সামান্য তেজস্ক্রিয়তাই উল্কাপিন্ডের মঙ্গলের উৎস সম্পর্কে ধারণা দেয়।

মঙ্গলে পানি আছে কি নেই তা এক রহস্য। যদিও বিজ্ঞানীরা মঙ্গলে বর্তমানে পানি আছে কিনা সে সম্পর্কে সরাসরি প্রমাণ পাননি, কিন্তু মঙ্গলের ইতিহাসে কোন একসময় যে পানি ছিল সে সম্পর্কে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। উল্কাপিন্ড ALH84001-এ কার্বনেট, সালফেট এবং হাইড্রেট এর মত রাসায়নিক যৌগ পাওয়া গেছে যা বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত যে শুধুমাত্র প্রস্তর খন্ডের মধ্য দিয়ে পানি প্রবাহিত হলেই কেবল এগুলো পাওয়া সম্ভব। এই যৌগগুলো গঠিত হয়েছে যখন উল্কাপিন্ডটি মঙ্গলের অংশ হিসাবে ছিল।

এর মধ্যে মঙ্গলে উল্কাপিন্ডের আঘাতে সৃষ্ট তরঙ্গাঘাতের ফলে ALH84001 এ কিছু বুদবুদও তৈরি হয়েছে। উল্কার আঘাতে যে তাপের সৃষ্টি হয়েছিল তাতে ALH84001 এর বেশ কিছু অংশ গলে যায় এবং পরবর্তীতে ঠান্ডা হওয়ার পর এতে তৈরি হয় বুদবুদ। এই বুদবুদের মধ্যেই আটকা পড়ে গিয়েছিল মঙ্গলের বাতাস।

ALH84001 মঙ্গলের অংশ হিসাবে কাটিয়ে দেয় চার বিলিয়ন বছর। মঙ্গলে যদি কোন সময় চরমজীবী ব্যাক্টেরিয়া তৈরি হয়ে থাকে তবে সেগুলোর মধ্যে কিছু হয়তো এই ক্ষুদ্র প্রস্তর খন্ডের চারপাশে বা ভিতরে আশ্রয় নিয়েছিল। তারপর প্রায় ১২ থেকে ১৭ মিলিয়ন বছর আগে অন্য এক উল্কার আঘাতে মঙ্গলের মায়া চিরতরে কাটিয়ে ALH84001 উৎক্ষিপ্ত হয় মহাশুন্যে। মহাশূন্যে থাকা অবস্থায় কসমিক রশ্মির (Cosmic Ray) পাল্লায় পড়ে ALH84001. এই কসমিক রশ্মি পৃথিবী বা মঙ্গলের বায়ুমন্ডলের কারণে ঢুকতে পারে না। কসমিক রশ্মির কারণে ALH84001 এর হিলিয়াম, নিওন এবং আরগন অণুর পারমাণবিক কেন্দ্রে কিছু পরিবর্তন ঘটায়। এই পরিবর্তন কোন গ্রহে অবস্থিত পাথর খন্ডের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় না। কোন একটি প্রস্তর খন্ডের রাসায়নিক পদার্থ, এয়ার বাবল এবং এর পরমাণুর মধ্যে কি ধরনের পরিবর্তন এসেছে তা পরীক্ষা করে বিজ্ঞানীরা বলে দিতে পারেন এর উৎস কোথায় এবং কোথা থেকে এসেছে।

এক অক্ষ থেকে অন্য অক্ষে ঘোরাঘুরি করতে করতে প্রায় তের হাজার বছর আগে ALH84001 জড়িয়ে পড়ে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের মায়াজালে এবং এসে পতিত হয় দক্ষিণ মেরুর আল্যান হিল (Allan Hill) নামের একটি হিমবাহের উপর। ১৯৮৪ সালে ভূতত্ত্ববিদ রবার্টা স্কোর (Roberta Score) দক্ষিণ মেরু যান উল্কাপিন্ডের সন্ধানে। মঙ্গল থেকে আগত ৪.২ পাউন্ডের ALH84001 খুঁজে পান তিনি। উল্কাপিন্ডের নামের ALH এসেছে Allan Hill থেকে এবং 84 এসেছে ১৯৮৪ সালে আবিষ্কৃত হওয়ার কারণে।

সাম্প্রতিক গবেষণায় অবশ্য দেখা গেছে যে ALH84001 এন্টার্কটিকা বরফের এমিনো এসিড দিয়ে ব্যাপকভাবে দূষিত হয়ে গিয়েছিল। এই কারণে অবশ্য ALH84001-এ মঙ্গলের মাইক্রো-ফসিলের দাবী দুর্বল হয়ে পড়েছে।

উল্কাপিন্ডদের চৌম্বকীয় ধর্ম এবং এদের অভ্যন্তরে আটকে পড়া গ্যাসের গঠন-উপাদান বিশ্লেষণ করে বি পি ওয়েস (B. P. Weiss) এবং তার সহকর্মীরা দেখতে পেলেন যে, ALH84001 এবং সাতটি নাখলাইটের মধ্যে কমপক্ষে দু'টো মঙ্গলের পৃষ্ঠ ছাড়ার পর থেকে এ পর্যন্ত মাত্র কয়েকশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি উত্তপ্ত হয়নি। অধিকন্তু নাখলাইটগুলো যেহেতু অবিকৃত, তারমানে উচ্চ-চাপযুক্ত শকওয়েভ এদের গায়ে আচড় বসাতে পারেনি এবং এদের তাপমাত্রা ১০০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি উঠেনি।

পৃথিবীর অনেক আদিকোষী prokaryote (সরল এককোষী জীব যাদের নিউক্লিয়াসে ঝিল্লি নেই, যেমন ব্যাক্টেরিয়া) এবং প্রকৃতকোষী eukaryotes (সুনির্দিষ্ট নিউক্লিয়াস-বিশিষ্ট জীব) এই তাপমাত্রার টিকে থাকতে পারে। ওয়েসের গবেষণার এই ফলাফলই সর্বপ্রথম

পরীক্ষাপ্রাপ্ত প্রমাণ যাতে দেখা যায় যে, বস্তুখন্ড মূল গ্রহ থেকে উৎক্ষিপ্ত হওয়া থেকে শুরু করে পতন পর্যন্ত কোন পর্যায়েই এমন তাপমাত্রায় না পৌঁছেও এক গ্রহ থেকে অন্য গ্রহে পরিভ্রমণ করতে পারে যাতে এর অভ্যন্তরস্থ জৈবিক প্রাণ পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে না যায়।

প্যানস্পারমিয়া সংঘটনের ক্ষেত্রে অণুজীবদের শুধুমাত্র প্রথম গ্রহের বিচ্যুত এবং দ্বিতীয় গ্রহের বায়ুমন্ডলে প্রবেশের সময়ই টিকে থাকতে হয় না বরং একই সাথে এক গ্রহ থেকে অন্য গ্রহে ভ্রমনের মধ্যবর্তী সময়টাতেও টিকে থাকতে হয়।

জীবনবাহক উল্কাপিন্ডদেরকে মহাকাশের শুন্যতা, তাপমাত্রার চরম অবস্থা এবং কয়েকটি বিভিন্ন ধরনের বিকিরণকে মোকাবিলা করতে হয়। এর মধ্যে সবচেয়ে ভয়ংকর হচ্ছে সূর্যের উচ্চ-শক্তিসম্পন্ন অতিবেগুনী রশ্মি (Ultra violet Ray বা UV) যা জৈবিক অণুর কার্বন পরমাণুর বন্ধনকে ভেঙ্গে দেয়। তবে UV থেকে বাচাঁর উপায়ও খুব সোজা। এক মিটারের মিলিয়ন ভাগের একভাগ সমান দৈর্ঘের অসচ্ছ বস্তুই একটি ব্যক্টেরিয়াকে রক্ষা করার জন্যই যথেষ্ট।

চিত্র ৭.৩ : নাসার LDEF ছয় বছর ধরে মহাশূন্যে Bacillus Subtilis ব্যকটেরিয়ার অনুজীব বহন করেছিল। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে, খুব পাতলা অ্যালুমিনিয়ামের আস্তরণই আশি শতাংশ অনুজীবকে তেজস্ক্রিয়তার হাত থেকে বাঁচানোর জন্য যথেষ্ট ছিল।

১৯৮৪ সালে উৎক্ষিপ্ত এবং এর ছয় বছর পর কক্ষপথ থেকে ফিরিয়ে আনা নাসার স্যাটেলাইট Long Duration Exposure Facility (LDEF) কে ব্যবহার করা এক পরীক্ষায় দেখা যায় যে, পাতলা একটি এলুমিনিয়ামের আস্তরনই ব্যক্টেরিয়া প্রজাতি *Bacillus subtilis* এর অণুবীজ (spore) এর ক্ষেত্রে অতিবেগুনী রশ্মির বিপক্ষে ঢাল হিসাবে যথেষ্ট ছিল। UV থেকে রক্ষিত হওয়া কিন্তু মহাকাশের অসীম শূন্যতা এবং চরম তাপমাত্রা মোকাবেলা করা ওই সমস্ত স্পোরের আশি শতাংশই মিশন শেষে টিকে ছিল। অন্যদিকে এলুমিনিয়াম ঢাল দিয়ে প্রতিরোধ না করা অণুবীজগুলোর যদিও অধিকাংশই অতিবেগুনী রশ্মির আক্রমনে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তারপরও সবগুলো কিন্তু নয়। UV ঢালবিহীন অণুবীজগুলোর প্রতি দশ হাজারে অন্ততঃ একটি অণুবীজ বেঁচে ছিল। গ্লুকোজ এবং লবনের মতো উপাদানের উপস্থিতি তাদের টিকে থাকার হারকে বাড়িয়ে দেয়। দেখা গেছে ক্ষুদ্র ধূলিকণার আস্তরণের মধ্যে বসবাসকারী ব্যক্টেরিয়ার কলোনীকে সৌর বিকিরণ সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করতে পারে না। আর এই কলোনি যদি নুড়ি আকৃতির কোন প্রস্তর খন্ডের মধ্যে থাকে তবে সেটার অতিবেগুনী রশ্মি প্রতিরোধের ক্ষমতা বেড়ে যায় অনেক অনেক বেশি পরিমাণে।

যেহেতু এই গবেষণা হয়েছিল পৃথিবীর চৌম্বকীয় প্রতিরক্ষা ব্যুহের অনেক ভেতরে স্বল্পমাত্রার দূরত্বের কক্ষপথে। কাজেই এই গবেষণা আন্তঃগ্রহিক আহিত কণা (Charged Particles)-এর প্রভাব সম্পর্কে ধারণা দিতে সক্ষম হয়নি। কারণ এই চার্জড পার্টিকল পৃথিবীর চৌম্বকীয় ক্ষেত্রের ভিতরে প্রবেশ করতে পারে না। মাঝে মাঝে সূর্য বিপুল পরিমাণ এনার্জেটিক আয়ন এবং ইলেকট্রন উদগীরণ করে থাকে। এ ছাড়া মহাজাগতিক বিকিরণের মূল উপাদান চার্জড পার্টিকলগুলো প্রতি মুহূর্তেই আঘাত হানছে সৌরজগতে। জীবন্ত সত্ত্বাকে চার্জড পার্টিকল বা গামা রশ্মির মতো উচ্চ শক্তি সম্পন্ন বিকিরণ থেকে রক্ষা করা অতি বেগুনী রশ্মির হাত থেকে রক্ষা করার চেয়ে অনেক জটিলতর। সামান্য কয়েক মাইক্রণ প্রশস্ত প্রস্তরের স্তর বা ঢাল (shielding) অতি বেগুনী রশ্মিকে প্রতিরোধ করতে সক্ষম। কিন্তু অতিরিক্ত শিলডিং বস্তুত অন্য ধরনের বিকিরণের মাত্রাকে বাড়িয়ে দেয়। আহিত কণা এবং উচ্চ শক্তির ফোটন শিলডিং এর সাথে মিথস্ক্রিয়া করে উল্কাপিন্ডের অভ্যন্তরে অসংখ্য মাধ্যমিক বিকিরণের জন্ম দেয়।

দুই মিটার বা তার চেয়ে বেশি ব্যাসের প্রস্তর না হলে এই বিকিরণ উল্কাপিন্ডের অভ্যন্তরের যে কোন অণুজীবকে ধ্বংস করে দিতে পারে। আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে, বড় ধরনের প্রস্তরখন্ডগুলো খুব দ্রুত আন্তঃগ্রহিক পরিভ্রমন সাধারণত করে না। কাজেই UV প্রতিরোধের সাথে সাথে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে মহাকাশের বিকিরণকে একটি অণুজীব কতখানি সফলভাবে প্রতিরোধ করতে পারে এবং কত দ্রুত জীবন বহনকারী উল্কাপিন্ড এক গ্রহ থেকে অন্য গ্রহে

যেতে পারে। ভ্রমণ যত দ্রুত হবে বিকিরণের মাত্রা তত কম হবে। ফলশ্রুতিতে অণুজীবের টিকে থাকার সম্ভাবনাও তত বেশি হবে।

B. subtilis বিকিরণ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে বেশ শক্তপোক্ত। ১৯৫০ সালে কৃষি বিজ্ঞানী আর্থার ডব্লিউ এন্ডার্সনের (Arthur W. Anderson) আবিষ্কৃত ব্যাক্টেরিয়াল প্রজাতি Deinococus radiodurans অবশ্য B. subtilis এর চেয়েও বেশি বিকিরণ প্রতিরোধে সক্ষম। খাদ্যকে জীবাণুমুক্ত করতে যে পরিমাণ বিকিরণ প্রয়োগ করা হয় তা উপেক্ষা করেও এরা টিকে থাকতে পারে। এমনকি আণবিক চুল্লিতেও এরা বেঁচে বর্তে থাকতে পারে।

Deinococus radiodurans এর ডিএনএ মেরামত করার জন্য যে কোষীয় প্রক্রিয়া সাহায্য করে তাই এর কোষের চারপাশে অতিরিক্ত মোটা দেয়াল তৈরি করে ফেলে। এই ডিএনএ বিকিরণ থেকে বাঁচানোর সাথে সাথে পানিশূন্যতার ফলে যে ক্ষতি হয় তাও পূরণ করার চেষ্টা করে। তাত্ত্বিকভাবে, উপরোক্ত বৈশিষ্ট্য-সম্পন্ন জীবাণুসমূহ যদি মঙ্গল থেকে উৎক্ষিপ্ত কোন উল্কাপিন্ড যা ALH84001 বা অন্য কোন নাখলাইটের মত উত্তপ্ত না হয় তবে ওই সমস্ত জীবাণুর একটা অংশ দীর্ঘ সময় পরেও টিকে থাকার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।

পৃথিবীর চৌম্বকীয় ক্ষেত্রের বাইরে স্পোর বা জটিল অণুদের সুদীর্ঘকাল টিকে থাকার বিষয়ে সত্যিকার অর্থে তেমন কোন পরীক্ষা করা হয়নি। এই ধরনের পরীক্ষা চন্দ্রপৃষ্ঠে করা সম্ভব। জৈবিক বস্তুসমুহ সিম্যুলেটেড উল্কাপিন্ডের মধ্যে ভরে মহাকাশে ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে এবং পরবর্তীতে দেখা যেতে পারে সেগুলোতে কি ধরনের প্রভাব পড়েছে। এপোলো মিশনে কিন্তু জৈবিক নমুনা নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তবে যেহেতু এই নমুনা নভোযানের ভেতরেই ছিল কাজেই সেগুলো পুরোপুরি মহাজাগতিক বিকিরণে আক্রান্ত হয়নি। ভবিষ্যতে বিজ্ঞানীরা জৈবিক নমুনা চন্দ্রপৃষ্ঠে বা মহাকাশের কোথাও রেখে দিতে পারেন এবং বেশ কয়েক বছর পর পৃথিবীতে ফিরিয়ে এনে গবেষণাগারে বিশ্লেষণ করে দেখতে পারেন। বিজ্ঞানীরা বর্তমানে বেশ গুরুত্বের সাথেই এই ধারণাটি নিয়ে চিন্তাভাবনা করছেন।

ইতোমধ্যে অবশ্য দীর্ঘমেয়াদী Martian Radiation Environment Experiment (MARIE) চালু হয়ে গেছে। ২০০১ সালে মঙ্গলের ওডিসি অর্বিটারের (Odyssey Orbiter) অংশ হিসাবে এই প্রকল্প চালু হয়। MARIE-এর যন্ত্রপাতিসমূহ নভোযান মঙ্গলের চারপাশে ঘোরার সময় মহাজাগতিক বিকিরণ এবং সূর্যের আহিত কণাদের পরিমাণ মেপে নিচ্ছে। যদিও MARIE-তে কোন জৈবিক বস্তু নেই তবুও এর সংবেদক (sensor) এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যে এটা ডিএনএ এর জন্য ক্ষতিকর বিকিরণকে চিহ্নিত করতে সক্ষম।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, তাত্ত্বিকভাবে প্যানস্পারমিয়া ঘটা অসম্ভব নয়। এই অনুকল্পের কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপাদান একে সম্ভাবনা থেকে বস্তুনিষ্ঠ (Quantitative) বিজ্ঞানের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। উল্কা সংক্রান্ত তথ্য প্রমাণাদি থেকে দেখা যাচ্ছে যে, সৌর জগতের আদি থেকেই বস্তুপিন্ড এক গ্রহ থেকে অন্য গ্রহে স্থানান্তরিত হয়ে এসেছে এবং বর্তমানেও তা বেশ ব্যাপকভাবেই ঘটে চলেছে। তাছাড়া, গবেষণাগারে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, মঙ্গল থেকে বিচ্যুত উল্কাপিন্ডের অভ্যন্তরে বেশ ভাল সংখ্যক অণুজীবই বিচ্যুতির ধাক্কা এবং পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে প্রবেশের বিপদসংকুল অবস্থাকে সামাল দিয়ে টিকে থাকতে পারে। কিন্তু প্যানস্পারমিয়া অনুকল্পের অন্য অংশগুলো এতো সহজে প্রমাণ করা যায় না। *B. subtilis* বা *D. radidurans*-এর মতো বিকিরণ প্রতিরোধক জীবাণুর আন্তঃগ্রহিক পরিভ্রমণে টিকে থাকতে পারবে কিনা সে সম্পর্কে গবেষকদের আরো অনেক বেশি তথ্য-প্রমাণ দরকার। তারপরও এ ধরনের গবেষণা পৃথিবীর প্রাণিমন্ডলে সত্যিকার অর্থে কি ঘটেছিল তা কখনই প্রকাশ করতে পারবে না, কেননা পরীক্ষাগুলো বর্তমান পৃথিবীর 'প্রাণ' নিয়ে জড়িত। কয়েক বিলিয়ন বছর আগের জীবাণুদের টিকে থাকার ক্ষমতা হয়তো একনকার তুলনায় ভিন্ন ছিল। হয়তো বা বেশি ছিল বা হয়তো কম ছিল।

এছাড়াও, বিজ্ঞানীরা এখনো সুনির্দিষ্ট কোন প্রমাণ হাজির করতে পারেননি যে পৃথিবীর বাইরে অন্য কোন গ্রহে একসময় প্রাণ ছিল। অন্য কোন গ্রহে অজৈবজনি (abiogenesis) ঘটার সম্ভাবনা সম্পর্কে কোন ধরনের সিদ্ধান্তে আসার জন্য বিজ্ঞানীরা কোন ধরণের প্রাণেরই উৎপত্তি সম্পর্কে নিঃসন্দেহ নন। সহায়ক উপাদান এবং পরিবেশ থাকা সত্ত্বেও 'প্রাণ'-এর উৎপত্তি হতে হয়তো কয়েক মিলিয়ন বছর সময় লেগেছে অথবা এর বিপরীত হতে পারে। প্রাণের বিকাশের জন্য হয়তো মিনিট পাঁচেক সময় লেগেছে। আমরা শুধু এইটুকু নিশ্চিত করে বলতে পারি যে, ২.৭ বিলিয়ন বা তার কয়েক মিলিয়ন বছর আগে পৃথিবীতে 'প্রাণ' তৈরি হয়ে গিয়েছিল।

যেহেতু এই মুহূর্তে প্যানস্পারমিয়া দৃশ্যপটের সবগুলো ধাপকেই পরিমাপযোগ্য করা সম্ভব নয়, কাজেই গবেষকরা একটি নির্দিষ্ট সময়ে পৃথিবীতে কি পরিমাণ জৈবিক পদার্থ বা জীবন্ত কোষ পৃথিবীতে এসেছে তা পরিমাপ করতে পারছেন না। অধিকন্তু, জীবন্ত কোষের স্থানান্তরই প্রমাণ করে না যে গ্রহনকারী গ্রহে এর কারণেই প্রাণের বিকাশ ঘটেছে। বিশেষ করে ওই গ্রহে যদি আগে থেকেই প্রাণের অস্তিত্ব থাকে তবে এ বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো আরো কঠিন। উদাহরনস্বরূপ বলা যায় যে, যদি পৃথিবীতে প্রাণের উৎপত্তির পর মঙ্গলের অণুজীব পৃথিবীতে এসেও থাকে তবে তা হয়তো পৃথিবীর প্রাণসমূহকে প্রতিস্থাপিত বা পৃথিবীর প্রাণের সাথে সহাবস্থান কোনটাই করতে পারেনি। তবে এটাও সম্ভব যে, মঙ্গলের প্রাণ হয়তো পৃথিবীতে আমাদের নাকের ডগাতেই আছে কিন্তু বিজ্ঞানীরা এখন পর্যন্ত খুঁজে পাননি। এ পর্যন্ত পৃথিবীর

সকল ব্যাক্টেরিয়া প্রজাতির মাত্র কয়েক শতাংশকে চিহ্নিত করা গেছে। পৃথিবীর প্রাণের সঙ্গে উত্তরাধিকারসূত্রে অসম্পর্কযুক্ত প্রাণগুলো এখন পর্যন্ত চিহ্নিত না হয়ে থাকা বিচিত্র কিছু না।

অন্য কোন গ্রহে প্রাণ আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা হয়তো প্যানস্পারমিয়া আদৌ ঘটেছে কিনা বা কি পরিমানে ঘটেছে তা জানতে সক্ষম হবেন না। ধরা যাক, ভবিষ্যতের কোন অনুসন্ধান মঙ্গলে প্রাণের অস্তিত্ব খুঁজে পেল এবং জানালো যে মঙ্গলের জৈব-রসায়ন আমাদের পৃথিবীর তুলনায় পুরোপুরি ভিন্ন। সেক্ষত্রে বিজ্ঞানীরা তাৎক্ষনিকভাবেই জেনে যাবেন যে, পৃথিবীর 'প্রাণ' মঙ্গল থেকে আসেনি। কিন্তু জৈব-রসায়ন যদি একই রকমের হয় তবে এই ধরনের একটি অনুমানে আসা যেতে পারে যে এদের উৎস হয়তো বা একই। ধরে নেওয়া যাক যে, মঙ্গলের 'প্রাণ' বংশগতীয় তথ্য মজুদ করার জন্য ডিএনএ ব্যবহার করে থাকে। বিজ্ঞানীরা নিউক্লিওটাইড অণুক্রম বিশ্লেষণ করে বের করতে পারবে যে মঙ্গল এবং পৃথিবীর প্রাণের উৎস একই কিনা। পৃথিবীর প্রাণীদের মত প্রোটিন তৈরির জন্য মঙ্গলের প্রাণীদের ডিএনএ অণুক্রম যদি একই বংশগতীয় সঙ্কেত অনুসরণ না করে তবে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যেতে পারে যে, মঙ্গল-পৃথিবী প্যানস্পারমিয়া অনিশ্চিত। কিন্তু এর বাইরেও আরো অনেক সম্ভাবনা থাকতে পারে। বিজ্ঞানীরা হয়তো দেখতে পারেন যে, মঙ্গলের প্রাণীরা প্রতিরূপ সৃষ্টির জন্য আরএনএ বা অন্য কিছুকে ব্যবহার করে থাকে।

পৃথিবীতে 'প্রাণ' নিজস্ব ভাবে তৈরি হোক বা বহির্বিশ্ব থেকে আসুক অথবা এর মধ্যবর্তী অন্য কোন পরিস্থিতিতেই উৎপন্ন হোক না কেন সঠিক উত্তরটি জানা আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মঙ্গল-পৃথিবীর প্যানস্পারমিয়া যদি সত্যি হয় তবে বোঝা যাবে যে, প্রাণ যেখানেই উৎপন্ন হোক না কেন, উৎপত্তির পর তা মহাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়তে সক্ষম। তবে অন্যদিকে, বিজ্ঞানীরা যদি দেখেন যে মঙ্গলের প্রাণ স্বতন্ত্রভাবে উৎপত্তি হয়েছে সেক্ষেত্রেও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাবে যে জড় থেকে জীবের 'অজৈবজনি' মহাবিশ্বের যে কোন জায়গাতেই খুব সহজেই ঘটতে পারে।

অক্টোবর ১৮, ২০০৬

{ *সপ্তম অধ্যায়, প্রাণের উৎস সন্ধানে (প্রাণের প্রাণ জাগিছে তোমারি প্রাণে)* : অভিজিৎ রায় এবং ফরিদ আহমেদ; অবসর প্রকাশনী, ঢাকা থেকে ২০০৭ এর ফেব্রুয়ারী প্রকাশিতব্য }

পরবর্তী পর্ব দ্রষ্টব্য...